লক ডাউন

কালিদাস ভদ্র

রোজই ননীগোপাল নববারাকপুর স্টেশনে চলে আসে। সন্ধ্যা হলেই আর ঘরে মন টেকে না। হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফর্মের উপর এসে দাঁড়ায়। প্লাটফর্মের ঠিক মাঝখানে ওভার ব্রিজ। তার পাশেই বেশ ঝকমকে ল্যাটট্রিন।

এখন ল্যাটট্রিন শুকনো খটখটে। কটু গন্ধের মাদকতা নেই। নাক টেনে বারবার গন্ধটা নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল ননীগোপাল। অফিস টাইমের ভিড়ে গমগম করতো যে স্টেশন সেখানে এখন গভীর নীরবতা।

লক ডাউন শুরু হতেই ট্রেন চলা বন্ধ। দীর্ঘ ছয় মাস কোনো যাত্রীর পা পড়েনি প্লাটফর্মে। যেখানে ছয়মাস আগেও তিল ধারণের জায়গা থাকত না, সেখানে এখন শুধুই শূন্যতা। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। স্টেশনের উপরের সব দোকানগুলোও এখন বন্ধ। নিচে কালো অন্ধকার মেখে শুয়ে আছে রেল লাইনগুলো। পিঠের পরে প্লাটফর্মের দু-চারটে লাইটের আবছা আলো পড়েছে।

ল্যাটট্রিনে দাঁড়িয়ে ননীগোপালের মৃদু হাসি এল ঠোঁটে। মনে মনে ভাবল কত মানিব্যাগ এখানে সে প্রতিদিন ফেলেছে। ভিড় ট্রেনে সুবিধামতো জায়গা করে নিত সে অনায়াসে। তারপর ধীরে ধীরে যাত্রী বুঝে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার হাতের আঙুল চালিয়ে দিত পকেটে। ননীগোপালের হাতের আঙুল মাখনের উপর ছুরি চালানোর মতো দারুণ মসৃণভাবে ঢুকে যেত পকেটে, কখনও আবার ব্যাগে।

নিপুণ দক্ষতায় অনায়াসে মানিব্যাগ হাতড়ে নিয়ে নেমে পড়তো নব বারাকপুর স্টেশনে। স্টেশনে নেমেই এই ল্যাটট্রিনে টাকা বের করে মানিব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিত।

অকালে বাবা মারা যাওয়ায় হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর আর কলেজে যাওয়া হয়নি ননীগোপালের। অভাবের জ্বালা তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল। কলেজ সিট্রটে জুতোর দোকানে কাজ পেয়েছিল একটা। বেশ ক'বছর পরে সে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছিল ননীগোপাল। তার পরে এক বন্ধুর সাহায্যে বড় বাজারে কাপড়ের দোকানে কাজ পেয়েছিল। কিন্তু সে কাজও এক বছরের মধ্যে চলে যায়।

দুঃখে ননীগোপাল একদিন কলেজ স্কোয়ার পার্কে বসে সুইমিং পুলের জল দেখতে দেখতে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিল। তখনই তার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়ায় সুবল। হাতের ইশারায় জানতে চায় তার নাম। সাথে সাথে নিজের নামও বলে ফিসফিস গলায়।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ননীগোপাল তাকায় তার মুখের দিকে। তারপর নিজের নাম বলে

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে ননীগোপাল।

সুবল সামান্য ঝুঁকে ননীগোপালের হাতটা ধরে বলল, দুঃখ সবার জীবনেই আসে। কাজ নেই তো কি হয়েছে, আমার সাথে কাজ করবে?

—কী কাজ?

—আগে বল রাজি কি না!

—হ্যাঁ যা বলবে তাই করব। হকারি টকারি সব করতে এখন রাজি। কথাগুলো বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ননীগোপাল।

ফিসফিস করে সুবল বলল, হকারি টকারি নয়, পাতি পকেটমারী। করবে আমার সাথে? আমার সাঙাৎ হবে?

—ওরে বাবা ধরা পড়লে যে চামড়া গুটিয়ে দেবে। ভয়ার্ত মুখে ননীগোপাল কথাটা বলে উদাস চোখে তাকাল সুবলের দিকে।

সুবল বলল, ভয় পেলে তো পেট ভরবে না। কে তোমায় কাজ দেবে। আজকের দিনে কাজ পাওয়া যেমন কঠিন তেমন কাজ রাখাও আরও কঠিন। কিন্তু সোজা হল নিজেই নিজের কাজ তৈরি করে নেওয়া। মানে স্বনিযুক্তি। যেমন আমার এই পকেটমারি। নিজেই নিজের কাজের মালিক। কাজ হলে আয়। না হলে বেকার।

মনে একটু সাহস হল সুবলের কথায়। ননীগোপাল তাই প্রশ্ন করল, কোথায় পকেটমারি করো তুমি?

—এই তো এই শিয়ালদা থেকে হাওড়া বাসে। অফিসটাইমে ভিড় হলেই আমার কাজ সহজ হয়। ভীড়ে ঠেলেঠুলে ঢুকে সন্ধানী চোখে খদ্দের খুঁজে দাঁড়ালেই কাজের সুবিধা হয়। তারপর বাস একটু জ্যামে আটকালেই কাজ সেরে রানিংয়ে নেমে পড়ি।

ননীগোপাল বলল, কখনও ধরা পড়নি?

—পড়িনি আবার! কতবারই তো বেধড়ক মার খেয়েছি। একবার এক মহিলার পার্স সাফাই করে নামার মুখে ওর বাচ্চা মেয়েটা দেখে চিৎকার করে ওঠায় ধরা পড়ে যাই। তারপর ট্রাফিক পুলিশের হাতে প্যাসেঞ্জাররা তুলে দেয়। পুলিশের হাতে মার খেয়ে এখন সাহস খুব বেড়ে গেছে।

দশ বছর ননীগোপাল বাসে বাসে সুবলের সঙ্গী হয়ে পকেট মেরেছে। এই কাজে সুবলের চেয়ে ননীগোপাল বেশ পটু হয়ে গেছে। তবে আঙুলে যেমন জাদু আছে তেমন চেহারাটাও বেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। মাথা ভর্তি কালো চুল আর টানাটানা মায়াবী চোখ দুটো ননীগোপালের সবাইকে আকর্ষণ করে। কেউ সন্দেহই করে না যে সে পকেটমার।

একবার ট্রাফিক জ্যামে বাস বহুক্ষণ আটকেছিল। যাত্রীদের মতো ননীগোপালও খুব বিরক্ত হয়ে উসখুস করছিল। সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথচ ননীগোপাল তেমন কোনো যাত্রীর পকেট কাটতে পারেনি। হঠাৎ মাঝবয়সী একজনকে দেখল বাসের

হ্যান্ডেল ধরে ঘনঘন চারদিক দেখছে।

ননীগোপালের সন্ধানী চোখ চলে গেল তার প্যান্টের পকেটের দিকে। পকেটটা বেশ উঁচু উঁচু দেখেই ঠাওর করে নিল যে বেশ ভালোরকম টাকাই আছে পকেটে। এত টাকা নিয়ে বাসে যাওয়ার সাহস দেখে ননীগোপাল খুশিতে ডগমগ হয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আঙুল চালিয়ে ব্লেডের নিপুণটানে টাকার প্যাকেটটা বের করে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে।

ননীগোপালের পিছন পিছন লোকটাও লাফিয়ে নেমে পড়ল। দৌড়ে ননীগোপালের জামার কলার ধরে বলল, এ্যাই ব্যাটা পকেটমার, আমার টাকা দে। বের কর বের কর টাকা।

কথা শেষ করেই লোকটা তার শক্ত হাতের মুঠিতে সজোরে একটা ঘুষি মারল। ঘুষি খেয়ে ননীগোপাল হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার পকেট থেকে টাকাগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল।

লোকটা টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বলল, জানিস ব্যাটা আমি তোর বাবা। তোর মতো পাতি বাসপকেটমার নই। রেল পকেটমার। আমার নাম রাখাল। রাখাল গাইন।

ননীগোপাল তার পর থেকে রাখালের সাথে শিয়ালদা-বনগাঁ, শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার ট্রেনে পকেট মারতে শুরু করে। দীর্ঘ বারো বছর রাখালের সাথে ট্রেনে পকেট মেরে সে এখন বেশ স্বচ্ছল। বিয়ে করেছে রাখালের একমাত্র মেয়ে চন্দনাকে। তার একটা ফুটফুটে পাঁচ বছরের মেয়ে হয়েছে। মেয়ে মাম্পী আর চন্দনাকে নিয়ে বেশ সুখেই কাটছিল জীবন। বিশরপাড়া কোদালিয়া স্টেশনের একটু দূরে দেড়কাঠা জমিতে একটা ছোট্ট বাড়িও করেছে।

রাখাল দেখেছে ননীগোপাল কিভাবে দিনরাত চর্চা করে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে পকেটমারীতে। তার দক্ষতা রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মদ গাঁজার নেশা তার নেই। নেই বিড়ি, গুটখা, পান খাওয়ার নেশাও। নেশা শুধু তার পেশা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। মাঝে মাঝে তাই সে ফোলানো বেলুনের উপর শুকনো কাপড় চাপিয়ে নতুন ব্লেডে টান দিয়ে দেখে। বেলুন ফেটে গেলে মুখ কাচুমাচু করে ননীগোপাল বলে, ধুর ছাই শেখা এখনও সম্পূর্ণ হল না।

ননীগোপালের কাজ আর সাধনা আচমকা যে করোনা মহামারী স্তব্ধ করে দেবে, সে স্বপ্নে কখনও ভাবেনি। ভাবেনি এভাবে লক ডাউন ঘোষণা করে সরকার জনজীবনের গতিতে শিকল পরিয়ে দেবে। কাজ হারিয়ে ননীগোপাল তাই খুবই বিমর্ষ। জমানো পুঁজি সব শেষ। এখন শুধু রেশনের বিনাপয়সার চাল ডালই পেট ভরানোর একমাত্র সম্বল। উনুনে আগুন ধরাতে বেগ পেতে হলেও পেটের আগুন দিনরাত ধিকিধিকি জ্বলছে।

কাজ হারানো বেকার ননীগোপাল তাই লকডাউনেও হাঁটতে হাঁটতে একা চলে

আসে নববারাকপুর রেল স্টেশনে। প্লাটফর্মের সেই তার স্মৃতি বিজড়িত ল্যাটট্রিনটার পাশে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওভার ব্রিজটার ওপরে কখনও কখনও উঠে একবার শিয়ালদা তো একবার বনগাঁর দিকে উঁকি দেয়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে মনে মনে বলে, ট্রেন কবে আবার চলবে!

নিরুত্তর মনে শুধু দুঃস্বপ্নের ছায়া ডানা মেলে দেয়। ননীগোপাল ভাবে সে তো কখনও কোনো গরিব মানুষের পকেটে হাত দেয়নি। বেঁচে থাকার জন্যে যা করেছে সব তার জ্ঞানবুদ্ধিমতো একটু পয়সাওয়ালা লোকের সাথে। চাকুরিজীবীদের সাথে।

ননীগোপল আনমনে ভাবতে ভাবতে ওভারব্রিজ থেকে নেমে এসে ল্যাটট্রিনটার পাশে আবার দাঁড়াল। হঠাৎ সে ওভার ব্রিজের উপরে তাকাতেই দেখল ঠিক ব্রিজের ওপরেই একথালা জ্যোৎস্না যেন সাজানো আছে। নিস্তব্ধ শুনশান স্টেশন। আশপাশের ফ্ল্যাটসুদ্ধ সবাই এখন তালাবন্ধ ঘরে টিভিতে মশগুল। কেউ কেউ হয়তো ফোনে খোশগল্পে মশগুল। তাদের ছেলেমেয়েরা নেটে গেম খেলছে কেউ কেউ। রেলপাড়ের বস্তিগুলোয় শুনশান। কোনো লোকজনকে বের হতে দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকফোকর দিয়ে কেবল ইলেকট্রিক আলো ছিটকে বের হচ্ছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় মাঝে মাঝে ভাসছে কদমফুলের গন্ধ।

ননী গোপালের মাথার চুল লকডাউনে বেশ বড় হয়ে যাওয়ায় বাতাসে ওর উড়ো ঝুরো চুল নিয়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। বারবার হাতদুটো দিয়ে শাসন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষে প্লাটফর্মের ওপর শেডের নিচে একটা বেঞ্চে এসে বসে পড়ল।

বেঞ্চে বসে বসে ভাবল আজও তবে বাড়ি গিয়ে চন্দনাকে কোনো সুখবর দিতে পারবে না। জানাতে পারবে না যে লকডাউন শিগগির উঠে যাবে। আবার সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।

অনেকক্ষণ ননীগোপাল হিজিবিজি এসব ভাবতে ভাবতে সামনে তাকিয়ে দেখল তার জুতোর দোকানের কর্মচারী বন্ধু সিরাজুলকে। সিরাজুল উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল, কি হে এত দিন কোথায় ছিলে?

—এই তো তোমাদের এখানেই।

সিরাজুল বলল, হ্যাঁ শুনেছিলাম তুমি নাকি এখন বিশরপাড়ায় থাকো। কিন্তু ঠিকানা না জানায় যেতে পারিনি। কিন্তু আজ এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।

ননীগোপাল একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, আমিও তো ভাবিনি তোমার দেখা পাবো কোনোদিন। তবে আশা ছিল দেখা হয়তো হবে। কারণ শুনেছিলাম তোমার বাড়ি শহিদ কলোনি। তাই হয়তো কোনো না কোনোদিন দেখা হবে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফর্মের মাথায় চলে এল। হঠাৎ সিরাজুল দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি ভাই ননী তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে?

ননীগোপাল ওর হাতটা ধরে বলল, আবার বেকার হয়ে গেছি ভাই। লকডাউন আমার কাজকর্ম কেড়ে নিয়েছে। কোনোমতে জীবনটা আছে এই অনেক। দেখনা জামাটা ছিঁড়ে কেমন হা করে আছে। পেটই চলছে না তো জামা কাপড় কিনবো কিভাবে। বৌ-মেয়েও অনেক কষ্টে মুখ বুজে আছে।

সিরাজুল জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় কাজ করছিলে, হ্যান্ড গ্লাবস ফ্যাক্টরিতে?

—না ভাই সে এক অন্য ধরনের কাজ।

—কি কাজ আমায় বলতে পারো। লজ্জা কোরো না।

—শুনবে সে করুণকাহিনী!

—হ্যাঁ বল, বল, কাজ কাজই। আমি কিছু মনে করবো না।

ননীগোপালের কাছে সব কাজ হারিয়ে শেষে তার পকেটমার হওয়ার কথা শুনে একটু চুপ করে গেল সিরাজুল। তবু মুখে বলল, কাজ, কাজই ভাই। কি করবে এ পোড়া দেশে আমাদের মতো শ্রমজীবীরা যে দাম না পেয়ে বার বার অন্যপথের দিকে পা বাড়ায়। পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা।

কথা বলতে বলতে দু'জনেই এক অন্য জগতে যেন চলে গেছে। ননীগোপাল তবু স্টেশনে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতেই তারা যেন শান্তি লাগে। এক অনন্ত শান্তি যেন এখানেই সে খুঁজে পায়। আনন্দঘন স্বপ্ন যেন এখানেই ফেলে দেওয়া মানিব্যাগের মতো ছড়ানো আছে। বেকার আর বিভ্রান্ত জীবন থেকে ননীগোপাল যে সুখ ঐশ্বর্য কুড়িয়ে এনেছে তা এই প্লাটফর্মের হাওয়া আর ধুলোকণা সাক্ষী আছে। গরিব আর দুঃখীর সে কেপমারি না করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল, তার জন্যে বেশ গর্ব হয় ল্যাটট্রিনটার পাশে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গন্ধের মাদকতায়।

খানিকটা ঝুঁকে সিরাজুল বলল, একটা কথা বলবো ভাই।

একটু এগিয়ে ননীগোপাল বলল, কী কথা ভাই!

—না, কিভাবে বলবো ভাবছি।

—তো সঙ্কোচ করছো কেন?

—আসলে এ কাজটাও তো অন্য রকম তাই বলতে ঠিক সাহস হচ্ছে না।

ননীগোপাল বলল,তোমার সাথে আমার এমন সম্পর্ক যে বলতে দ্বিধা করছো!

সিরাজুল, ফস করে বলল, তুমি চোলাই সাপ্লাই করবে?

—চোলাই মানে তোমাদের ওখানে যে দেশি মদ তৈরি হয়, তা অন্য জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে?

ননীগোপালের হাতটা ধরে সিরাজুল বলল, হ্যাঁ হাইওয়ের ধারে এখন অনেক মদের দোকান আছে।

লকডাউনেও গর্ভমেন্ট ওইসব দোকান খোলার অনুমতি দিয়েছে। সেই

দোকানের সঙ্গে দিশি বিক্রির একটা চেন আছে, তারাই তোমায় কাজ করলে টাকা দেবে।

অন্ধকারের মধ্যেও ননীগোপালের মুখটা যেন খুশিতে চকচক করে উঠল। কাজকর্ম না থাকায় এমনিতেই সে যেমন ভীষণ হাঁফিয়ে উঠেছিল, তেমন খিদের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল দাঁতে দাঁত চেপে গুমরে গুমরে মরছিল। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে তাই ছুটে আসছিল প্লাটফর্মে। বুকের মধ্যে ট্রেনের হুইশেল যেন বারবার বেজে উঠছিল। ভাবছিল এই বুঝি ট্রেন চলছে।

ননীগোপাল তাই সিরাজুলের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে নিতে ভুল করল না। দৃপ্ত গলায় বলল, সিরাজুল আমি রাজি। তুমি আমাকে কাজটা পাইয়ে দাও। কাল সকালেই আমি মেয়ে বউকে নিয়ে বিশরপাড়া ছেড়ে তোমাদের কলোনীতে চলে যাব। কম টাকায় আমায় থাকার একটা ঘর ঠিক করে দিও। আমি নতুন ভাবে নতুন কাজে আবার মন দেব।

সিরাজুল বলল, তোমার এই বাড়ি?

নদীগোপাল বলল, কাল সূর্য ওঠার আগে বাড়িতে তালা দিয়ে বেরিয়ে যাব। তোমার ঠিকানাটা দাও। আমার পরিযায়ী জীবন লক ডাউন ভেঙে শুরু হোক।